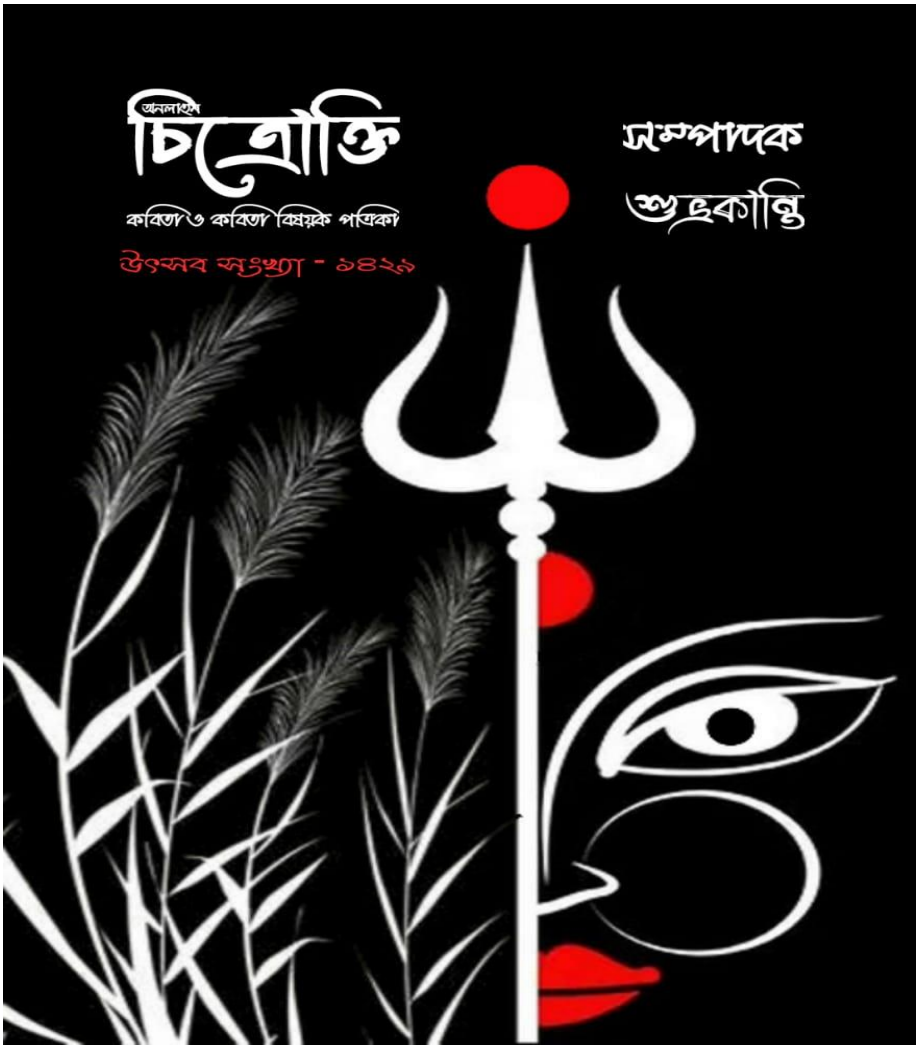

ত্রৈমাসিক অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা

পঁচিশ বর্ষ, ষষ্ঠ অনলাইন সংখ্যা,

সেপ্টেম্বর - অক্টোবর ২০২২, উৎসব সংখ্যা ১৪২৯

আপনারা জানেন **চিত্রোক্তি** - কবিতা ও কবিতা বিষয়ক পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬ সাল। কবি-সম্পাদক-গল্পকার শ্রী অমল করের একান্ত সহযোগিতা এবং সাহচর্যে চিত্রোক্তির পথ চলা শুরু হয়েছিল । ক্রমাগত নয়টি মুদ্রিত সংখ্যা প্রকাশ পাবার পরে বিভিন্ন কারণে এটি অনিয়মিত হয়ে পড়ে । যদিও চিত্রোক্তি পত্রিকা সামাজিক কাজকর্ম থেকে বা সাহিত্য থেকে কখনই বিচ্যুত হয়নি । এখন আবার নব কলেবরে অনলাইনে পুনরায় প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। আমরা এই সংখ্যার আগেই পাঁচটি অনলাইন সংখ্যা প্রকাশ করেছি। আশাকরি এই ষষ্ঠ সংখ্যাটিও সকলের ভালো লাগবে আগের সংখ্যাগুলোর মতই ।

সম্পাদক: শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়
প্রধান উপদেষ্টা: অমল কর
যুগ্ম-সম্পাদক: সম্রাট পাত্র, অরবিন্দ সাঁতরা

প্রচ্ছদ – গার্গী চট্টোপাধ্যায়

দপ্তর

"চিত্রোক্তি"
সম্পাদক - শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়

"আনন্দময়ী অ্যাপার্টমেন্ট" বোস পাড়া রোড, বড়িশা পূর্ব পোস্ট, কলকাতা – ৭০০০০৮	"আর ভি বৃন্দাবনম অ্যাপার্টমেন্ট" ব্লক - সি, বালাজি নগর, মিয়াপুর, হায়দ্রাবাদ - 500049, তেলেঙ্গানা

Email: write@chitroktipotrika.org
WhatsApp: 8297976134

www.chitroktipotrika.org
www.chitrokti.org

লেখক সূচি

কবিতা

- আশিস সান্যাল — যেদিন : 06
- পার্থ রাহা — আজ রাতে : 06
- দীপক কর — সে যেন রয়েছে কোথায় : 06
- তৃষ্ণা বসাক — যাই ২ : 06
- আবীর চট্টোপাধ্যায় — ভালোবাসায় : 07
- গৌরী সেনগুপ্ত — খোঁজ : 07
- তাপস মিত্র — প্রতিদিন দেড় জিবি করে : 07
- লিপিকা চট্টোপাধ্যায় — বৈরিতা : 08
- ব্রততী চক্রবর্তী — আসার আশা : 08
- বিকাশ ভট্টাচার্য — চোখের জলের তর্জমায় : 08
- মনোজ দাস — যত দহ যত বাঁক : 09
- নীলিমা সরকার — ভৈরবী আলাপ : 09
- কুশলকুমার বাগচী — রাতভোর খেলা : 09
- সাতকর্ণী ঘোষ — মেঘচুক্তি ৮ : 09
- অমৃতা চট্টোপাধ্যায় — ছায়ার মতোই : 10
- অমর চক্রবর্তী — পরিবর্তন : 10
- স্বাতী ঘোষ — এ গহনে : 10
- জ্যোৎস্নাময় ঘোষ — নষ্ট জীবন : 10
- ঝুমা সরকার — ভালোবাসা : 11
- বীথি কর — প্রেম : 11
- নির্মলেন্দু শাখারু — দুপুরের দিন গোনা : 11
- প্রদীপ দে — যান্ত্রিক : 11
- শঙ্খ অধিকারী — কাব্যলক্ষ্মী : 12
- নন্দিনী সরকার — প্রেম : 12
- কণিকা মল্লিক — স্মৃতিটুকু : 12
- চিন্ময়ী সেনশর্মা — সোয়াস্তি : 12
- তীর্থঙ্কর সুমিত — সবুজের পথে : 13
- নীলম সামন্ত — আঘাতে ঘর ভাঙে সূর্য না : 13
- পল্লব চট্টোপাধ্যায় — দেবী পক্ষ : 13
- মনোজ কুমার মণ্ডল — তমসো মা জ্যোতির্গময় : 13
- গোপেন মন্ডল — মাটির টানে : 14
- প্রমীলা মৈত্র — কোথায় পাব তারে : 14
- দেবযানী মহাপাত্র — জলের রঙ : 14
- শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায় — উদ্বাস্তু : 14

CHITROKTI PATRIKA

গুচ্ছ কবিতা

- শোভন বিশ্বাস — মা তোমাকে, কল্পনার কবি, জীবনের ওঠাপড়ায়, আলোর খোঁজ : 15
- দর্পণা গঙ্গোপাধ্যায় — যাযাবর, কলির প্রেম, কালি কলমে, চেয়ে থাকি, সেই মুখ : 16
- নীলাঞ্জনা হাজরা — প্রকৃতি প্রেমিকরা যদি মূর্তি প্রেমিক হয়, একটা গীট খুলতে পারিনি, সবুজ রেখাপাত, সাদা ফুল, একটা দিন : 17
- ঈশিতা পাল — বসন্তে ধূসর মেঘ, আমরা দুজনে, বন্ধু, দেখা হবে, ভুলে যেও প্রিয়, আমার স্বপ্ন : 18
- শুভদীপ দত্তপ্রামানিক — মহিষের ভাষা, শান্তিনিকেতন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পাঠাগার, জোনাকিসূত্র : 19

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

- ভবানীশংকর চক্রবর্তী — অমল কর - স্রষ্টা ও সৃষ্টি : 20

ছড়া

- ক্ষুদিরাম নস্কর — বাঘের ভাষণ : 22
- কার্ত্তিক মণ্ডল — শরতরাণী : 22
- মোহিত ব্যাপারী — হাসতে হবে : 22
- শ্রীকান্ত মাহাত — কলা গাছেতে কলা পেকেছে : 22

ভ্রমণ কাহিনি

- শ্রয়ণ সেন — পানাজির ‘ছোটো পর্তুগাল’-এ : 23

অনুবাদ কবিতা

- নীলাঞ্জন কুমার — মৃত্যু : 24

গল্প

- অমল কর — দিলরুবা : 25
- কাশীনাথ সাহা — ঈশ্বরের মুখ : 26

গ্রন্থ আলোচনা

- ভবানীশংকর চক্রবর্তী — উদ্রিক্ত বেদনার হুতাশ ও নাস্তিকতা : 27

ছোটোদের বিভাগ - আঁকিবুকি

- গার্গী চট্টোপাধ্যায় – নবম শ্রেণি : 28

CHITROKTI PATRIKA

কিছু কথা

স্বাধীনতার পর অধিকাংশ সময়ই ভারতের শাসনকর্তৃত্ব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কুক্ষিগত ছিল। অন্যদিকে রাজ্যগুলির রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) (সিপিআই(এম)) প্রভৃতি জাতীয় দল ও একাধিক আঞ্চলিক পার্টি।

সর্বভারতীয় দল বলতে হাতে গোনা কয়েকটি দল। তাই কেন্দ্রে ও রাজ্যে সরকার টিকিয়ে রাখতে আঞ্চলিক দলগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য। ভারতের পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনেও এসব দলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।
পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস, উত্তরপ্রদেশে বহুজন সমাজ পার্টি, সমাজবাদী পার্টি, পাঞ্জাবে আকালি দল, মহারাষ্ট্রে শিবসেনা, তামিলনাড়ুতে এআইএডিএমকে, ডিএমকে, ওড়িষ্যায় বিজু জনতা দলের মতো আঞ্চলিক দলগুলো অতীতেও বিভিন্ন সময়ে জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক আলোচনায় এসেছে।

কেন্দ্রে বা রাজ্যগুলিতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সরকার গঠনের দিন আর নেই। শুরু হয়েছে জোট সরকার গঠনের পালা। সেজন্য জাতীয় পর্যায়ের দলগুলোর আঞ্চলিক দলগুলির হাত না ধরে উপায় নেই। নির্বাচনের আগে বা পরে গাটছড়া বাঁধতে হয়। বর্তমানে ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে জোট সরকার তাই একটা দস্তুর। ভারতের কয়েক দশক ধরেই আঞ্চলিক দলগুলোর শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে।

বিগত বেশ কয়েকটা কেন্দ্রীয় সরকার তৈরি হয়েছে তাদেরই সমর্থনের ওপরে ভিত্তি করে।

তাদের আঞ্চলিক আশা-আকাঙ্খা জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে আর এবারের লোকসভা নির্বাচনে আঞ্চলিক দলগুলোই নির্ণায়ক শক্তি হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক – চিত্রোক্তি

কবিতা

আশিস সান্যাল
যেদিন

যেদিন দেখেছি তাকে
আজও মনে হয়
সে দিন ছিল আমার কাছে পরম বিস্ময়।
সে এক রূপসী এসে
বলেছে আমায়
কি চাও আমার কাছে আজ অবেলায়?

বললাম মৃদু হেসে
মাধুর্যে তোমার
ডুব দিয়ে পেতে চাই সুবর্ণ আলোক।
তোমার নির্মল স্পর্শে
পৃথিবীর সব বৃক্ষ
আজ ফের প্রত্যাশায় ফলবতী হোক।

তোমাকে দেখেছি আমি
যেদিন প্রথম
ফুটেছিল চারদিকে অজস্র বকুল।
সহসা নদীর জলে
তোমার মুখের মতো কল্লোলিত আলো,
সেদিন দেখেছি আমি
হৃদয়ের অন্ধকারে
চেনাপথ অকস্মাৎ নীরবে হারালো।

তৃষ্ণা বসাক
যাই ২

যাই, যাই কোনখানে? যেখানে সম্ভব নয় যাই,
ফেরার ব্যবস্থাগুলো করে যাই, অর্থাৎ অহংকারে যাই
অথচ এমন নয়, তুমি স্মৃতি নিয়ে ছেঁড়োখোঁড়ো
আমি তো বিবাহ জানি, এসো ডানায় গ্রন্থি জোড়ো
যাই যাই, প্রিয়নাম বলো, কোন মেঘশৃঙ্গ চাই?
বলো বলো কোনখানে? যেখানে সম্ভব নয় যাই।

পার্থ রাহা
আজ রাতে

আজ রাতে তোমার আকুল স্বর
আমার উপর
নেমে এসেছিল
তোমার কাঁপা কাঁপা আঙুলের স্পর্শে
আমার বুকের মধ্যে অনির্দেশ আকুলতা
তোমার শরীরে আমার শরীর
নতুন রক্তের জন্ম
অপার্থিব মুক্তির আনন্দ
এবং বিষাদ
জ্যোৎস্নার নির্জন আলোকহীনতায়
নীল গোলাপের গন্ধ

এবং মৃত্যুর।

দীপক কর
সে যেন রয়েছে কোথায়

আমার হৃদয়-দুয়ার খোলা
তারই জন্যে
যার অপেক্ষায় কাটে
আমার সারাটা বেলা।

আমি বসে থাকি
সবুজের শামিয়ানায়
বটবৃক্ষের ছায়ায়
পাখির কলতান
প্যালেটে রং মেশায়।

আমি গান করি তারই সুরে
ধরা আছে মনোবীণায়
কোমল সোহাগে।

আমি আছি শুধু আছি
সে যেন রয়েছে কোথায়!

আবীর চট্টোপাধ্যায়

ভালোবাসায়

শেষবেলায় আলোর ওড়না ঘিরে
নামতে দেখেছি রোজ রূপোলি সন্ধ্যা,
সময়ের কোনো এক নির্বাচিত খন্ডে;
এছাড়াও রোজকার অনির্বাচিত ভোরবেলাতে
আধো-অন্ধকার থেকেই যখন,
একতলা ছোঁয়া লেবু গাছ থেকে
বুলবুলিটা ডাকতে শুরু করে,
স্বপ্ন ফেলে উঠে আসার তাগিদ হয় মনে।

তবু প্রায়শই চলে আসে ফিরে আসার সময়
তেমনই রূপোলি সেই সন্ধ্যে
নির্বাচিত হবে ব'লে কাকুতি মিনতি করে,
দোলায় ওড়না, নানা রঙের;
আমার সমস্ত ভাবনা আর নির্বুদ্ধিতায়
সারা বুক জুড়ে অর্পিতা হয়ে,
নির্বাপিত সময়ের সঙ্গে মিলিত হয়;
এভাবেই এক সমগ্র সংসার বোনা হয়ে যায়
পাখির যৌথ বাসায়;
ভিতরের একটুকরো আঁধারের মতো,
সংগোপনে ভালবাসায়।

তাই ভেজা হাওয়ায় ভাসতে থাকার মানে,
ভালবাসা যদি,
একমুঠো ভালোলাগা কথার দেনায় চলা, মানেও
ভালবাসা ঠিক;
গলির মোড়ে ভিখারীকে দুটো টাকা দেবার অভিপ্রায়,
কোনো এক ভালবাসায়;
জীবনযুদ্ধে পরপর বিজয়ের হাসি যদি স্বাগত হয়
এক বোধ ভালবাসায়;
নয়ত সেই ভালবাসাই আজ তালিকাভুক্ত শহীদ;

সবশেষে,

কৃষক আজ যে জমির দাবিতে খুন,
শহীদ হতেও ভালবাসার দাম চোকাতে হয়;
বলে না তবু কেউ,
শহীদের প্রতি এ এক প্রাচীন ভালবাসা।
উলঙ্গ রাজপথে পড়ে থাকে আজ যত
অগণন দেহ, পাশেই নিয়মমাফিক কান্না ওঠে;
ওরাই আবার পাহারা দেয়,
দেহ নিতে আসা লোকজন তাড়ায়
ধরে থাকে দেহগুলোকে শেষবারের মতো,
শারীরবিজ্ঞানের ছুটকো জ্ঞানের বিপরীতে;
পারিনি থাকতে; ঝাঁপ দিয়েছিলাম তাই,
অন্ধকারের প্রতি তীব্র ভালবাসায়।

গৌরী সেনগুপ্ত

খোঁজ

বাতাসের নীচে ধীরে ধীরে
বিশৃঙ্খল হয়ে উঠছে দিনগুলো।
শীতল এক সমাজ
ধাতব আশ্রয়ের মধ্যে প্রসব হচ্ছে।
আর এখন সেই বয়ে যাওয়া সময়
আমাদের বুক ফুঁড়ে ছুরি চালিয়ে চলেছে।
আগুন যখন জন্ম নেয়
তার পিপাসার রঙেও একটা সুষমা থাকে
এখন সুষমাহীন ভালোবাসায় শুধু দাহ আছে
তাই গানগুলো শৃঙ্খলিত
পদক্ষেপ পদপিষ্ট
শুধু রাত্রিকে উজ্জ্বল করতে চেয়ে নক্ষত্ররা
রাস্তা দেখায়
অতলান্ত পার করে দেবে বলে
কলস্বর শুনতে পাই
এবার দিশাহারা বেগে ছুটছে মানুষ
একসাথে প্রবাহ ছুঁয়ে।

তাপস মিত্র

প্রতিদিন দেড় জিবি করে

কথা শেষ হলে জেগে থাকে অন্ধকার
তখন তো দিকশূণ্য সব কিছু একাকার
যতই জিজ্ঞাসা কর তুমি কার
উত্তর মেলেনা পড়ে থাকে ঘর সংসার

এ যাবৎ যত আলো ভালোবাসা দীর্ঘশ্বাস
যত ছায়া শরীর ভ্রমণ গোপন অন্তর্বাস
সমস্তই ছেঁড়া পাতা এত চাষ বাস
নষ্ট ফসল শুধু জল কাদা বুকের দু পাশ

জীবন তো পিঁপড়েরা মুখে করে বিজয় উল্লাস
দেড় জিবি রোদ্দুর চড়ুই ডানা অস্থায়ী সুবাস
আর যেটুকু গোপন ছিল ফিসফাস
কবে যে হারিয়ে গেছে সিঁড়ির বাঁকে সর্বনাশ

লিপিকা চট্টোপাধ্যায়

বৈরিতা

আজকে তোমার দখলদারি
কালকে মুছে যায়
অদল বদল শাসনযন্ত্রে
বারংবারই হয় ।
মুখোশনীতির মিথ্যার নেই
জবাব দেবার দায়,
মসনদের পরিধি জুড়ে
অনিশ্চিতের ভয় ।
কোন শ্রমিকের জীবন গেল
কোন কৃষকের ঘর
কোন শিশুটির ধর্ষিত হয়
বিপন্নতার স্বর ।
টাকার তোড়া হাত বদলায়
'একটু ছাড়তে হয়'
দিনের আলোয় শত্রু ওরা
রাতের নেশায় নয় ।
অর্থ শক্তি রক্তচক্ষু
জাগায় শিহরণ,
শোকের কান্না ভুলিয়ে দেবার
অনেক প্রলোভন ।
ফাটকা শপথ কণ্ঠ জুড়ে
আক্রোশ বা ঠাট্টা,
মাঞ্জা কমলে বক্তৃতাতে
ভোট হবে ভোকাট্টা।
সব হাহাকার, রক্তক্ষরণ
তোমার আছে, থাক।
হাড় মাংস আমার অস্ত্র
অঙ্গীকারের ডাক।
স্বপ্নে তোমার বাঁচার লড়াই
আমরা সাজাই লাশ ।
বৈরী বিরোধ বহ্নি বিষেই
আমার অধিবাস ।

ব্রততী চক্রবর্তী

আসার আশা

দিনটা এক-পা এক-পা
করে হাঁটতে হাঁটতে
দুপুর পেরিয়ে
বিকেলের কাছে
পৌঁছে গিয়েছে।
গাছেরা সবজে সোনালি
থেকে সিঁদুরে আবিরে
রং মাখামাখি!
এখন পৃথিবীর রাতপোশাকে
তারার জরি বুনছে আকাশ।
হালকা মেঘের পর্দায়
চাঁদের দুষ্টু লুকোচুরি।
এখনো কি তোমার
আসার সময় হল না?

বিকাশ ভট্টাচার্য

চোখের জলের তর্জমায়

চন্দ্রমুখী রোজই কাঁদে
গা গতরের ধকল দোষে
চোখে নীরব কান্না জমে
মাতাল পুরুষ যখন ফোঁসে

বনিবনা হচ্ছে না আর
পাতা ঝরছে খসছে পালক
শিমুল তুলো উড়ছে হাওয়ায়
ঘরগেরস্তি ওলটপালট

যত কাণ্ড রাতদুপুরে
জিভের ডগায় বিষ বয়ান
ড্রেনের পাশে দুখিরামের
নেশার ঘোরে চিৎ শয়ান

উথাল পাথাল ব্যথার সাগর
চোখের জলের তর্জমায়
ঝিলকে ওঠে অশ্রুনদী
চন্দ্রমুখীর চন্দ্রমায়

CHITROKTI PUBLICATION

মনোজ দাস
যত দহ যত বাঁক

চতুর্দিকে পৃথিবীর মধ্যে পৃথিবী,
মানুষের মধ্যে মানুষ,
এক এক ভাবনা, ভুবন।
এই যে তোমায় দেখি ----
মোহন বাঁশরীর সুরে গাঁথা দেহলতা,
আমার দুর্বলতা,
স্রোতস্বিনী সমুদ্র গামী;
নিশ্বাস প্রশ্বাসের ওঠানামা, বৃত্তান্ত তোমার
সবই তো আমার সৃজন।
তোমায় দৃশ্যমান যেটুকু দেখে দুনয়ন
সমস্ত আমারই চেতনাগত,
হৃদয় নিংড়ানো প্লাবন।
যে গল্প লেখা সময়ের পথে প্রান্তরে
যত কুশীলব গল্পের অবয়বে
সব আমারই জীবন এক এক চারণগত,
প্রত্যেক ফসলের মরশুমে উদ্গত।
কোনও মজদুরি নয় যাপনের সৌখিন জাঁকে,
সব আমারই জীবন দহে যত বাঁক, বাঁকে।
পুঞ্জীভূত জীবনের পরতে পরতে
আমারই বিস্মৃত কোনও বেভুল ঠিকানা,
রক্ত মাংস মজ্জায় অন্তহীন জীবন ছেনে আনা।

নীলিমা সরকার
ভৈরবী আলাপ

ঢেউয়ের মালায় লিখি শব্দের বিন্যাস
গহিন গাঙের নাচ
পালকের মতো উপহার
একমুঠো পথের সন্ধানে থাকে সমুদ্রের হাত
উদ্বেল উত্তুঙ্গ
তার থেকে এসে বসে বিপুলা পৃথিবী
স্বপ্নের দুয়ারে সেই আমার প্রেমজ

গ্রহণের তীরে তীরে অদ্ভুত আঁধার
দৃশ্যে দৃশ্যে পড়ে বরফের ফেনা
নিরন্তর জ্বালামুখে অর্ঘ্য করি
মোমের আগুন
নিবিড় আচ্ছেদে লেখা
শৈত্যের আগুন ঠেলে
চিরদিন জিজ্ঞাসার মতো
বেজে ওঠে
ভৈরবী আলাপ!

কুশলকুমার বাগচী
রাতভোর খেলা

বাঘবন্দি খেলা রপ্ত করিনি
জানিনা জলের অতল জীবিত না মৃত
যেটুকু জেনেছি পথের ধুলো ওলোট-
পালোট হলে
আত্মহত্যা করে টহলদারী রুমাল।
রাতভোর খেলায় ব্যস্ত তুমি
জানতেও পারলে না
মধ্যরাতে গাছেরাও অসংযমী হয়
অরণ্য জুড়ে তখন শুধুই
পাগল প্রেমের ছায়া...

সাতকর্ণী ঘোষ
মেঘচুক্তি ৮

আস্ত মেঘ গিলে খাচ্ছে চাঁদ
আমার ঘরে সূর্য আসে না
জ্যোৎস্না ছিল ভরে খাবার থালায়
আজ দেখি তা অন্ধকারে ছাই
ঘাঁটছি শুধু উড়ছে ধোঁয়া
আগুন উঠছে না

মেঘকে বলি তুই ফসল চিনিস না
একটুও তো বৃষ্টি দিতে পারিস
আমার ঘরে সেদ্ধ ভাতে ভাত
তোর জন্য আসন পাততে পারি
গতরে তোর চর্বি জমে আছে
একটু না হয় মর্নিং ওয়ার্ক কর

অমাবস্যা তোর বন্ধু হতে পারে
কালোয় কালোয় ঘনিষ্ঠতায় মাখিস
রাত্রিগুলোর তারায় তারায় ভাব
আদর স্নেহে ভরপুর এক আকাশ
অন্ধকার কতক্ষণ আর স্থায়ী
পূর্ণিমা চাঁদ উঠল এবার বলে

অমৃতা চট্টোপাধ্যায়
ছায়ার মতোই

যখন তোকে ভালোবাসি বলি খানিকটা মেঘকেও ভালোবাসি,
এমনটা নয়, তুই ছাড়া বাতাস আলো কাউকেই ভালোবাসি না,
যখন তোকে ভালোবাসি বলি,
ওই যে পাতার আড়ালে ফুটে ওঠা ফুল ওকেও ভালোবাসি,
তোকে ভালোবাসতে গিয়ে কতবার নিজেকেই ভালবেসেছি
তা বলতে গিয়ে একটা ইতিহাস লেখা হবে,
আসলে ভালোবাসা বড় প্রিয় ঠিক প্রিয় ছায়ার মতো -ই।

অমর চক্রবর্তী
পরিবর্তন

নিসর্গ পালটে যায় মেঘ বৃষ্টি রোদ
কখনো প্রেয়সীর মতো চঞ্চল
কখনো সুরের অঞ্জলি
একলহমায় পালটে গিয়ে
আনে অন্ধকার ছিঁড়ে ফেলে
উৎসবের ফুলগুলি

মানুষ!
মানুষও পালটাচ্ছে দ্রুত
যার কাছে ভরসা চাই তার অঞ্চলও উপদ্রুত
মানুষ থাকতে চাইছে না ভাবব্রহ্মের মুগ্ধতায়
ভাটিয়ালি ভাওয়াইয়া ভুলে
যেন রিমিক্সেই শরীর নাচায়,
কোলাহল মেতেছে আজ মাধুর্য ভাঙায়...

আকাশ পালটাতে দেখে আমরা অবাক হই না
একটু একটু স্মরণযোগ্য থাকুক প্রতিপদ থেকে
পূর্ণিমা
প্রকৃতির পরিবর্তন দেখি, সহ্য করি
শীতে বৃষ্টি এলেও এফআইআর করি না...

আমি ভয় পাই, অবাক হই মানুষের পতনে,
যখন মানুষ স্বেচ্ছাচারী অন্যকে ঠকিয়ে অর্থের
পাহাড় জমায়
আমিও পরিবর্তিত হতে চাই কলরবে, জানান দিই
সমুদ্র গর্জনে।

স্বাতী ঘোষ
এ গহনে

ভালোবাসাকে চিনতে পেরেছ
জীবনকে চিনতে পেরেছ?
ভালোবেসো, কিন্তু বুঝে নিও
জীবন আসলে কি
হৃদয় যখন তরঙ্গ পাঠায়
যখন অনুরণন ওঠে
হৃদয়ের তারে
তখন জেনে নিও ভালোবাসা_
বলিনি কোনো কথা
শুধু পাঠিয়েছি হৃদয়ের ওম
মুখের ভাষায় তো বোঝাতে পারিনি
আমার হৃদয় কি বলে
সে-ও বোঝেনি এই চুপ করে থাকার মানে
ব্যথায় নীল হয়ে যাওয়া হৃৎপিণ্ড আঁকড়ে ধরে
চেয়ে থেকেছি তার
অলস গোড়ালির কাছে
ঘিরে থাকা নূপুরের
ঝিকিয়ে ওঠা মুক্তোর দিকে...

জ্যোৎস্নাময় ঘোষ
নষ্ট জীবন

আলোর সূর্যের মুখ দেখা হল না
অকাল মেঘে ঢেকে গেল আকাশের তারা
চিররাহুগ্রস্ত হয়ে থাকল পূর্ণিমার রুপালি চাঁদ
শুধু ব্যর্থতার বিষাদে আচ্ছন্ন প্রতিটি রাত
কেমন করে ভাবতে পারে সুন্দর জীবনের স্বপ্ন
জাগরণের প্রতিটি মুহূর্ত ধর্ষিত হয় অপ্রত্যাশিত আঘাতে
নেশার দাসত্ব করে তিল তিল করে মৃত্যুর পানে ধাবমান
যে জীবন তবুও লড়াইয়ের ময়দানে ভীষ্মের মতো অবিচল
কখনো পিছু হটতে শেখেনি অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে
অনলস চেষ্টায় তবুও পার হতে পারে না সংসার বৈতরণী
সে জীবন তবু খুঁজে ফেরে অসংখ্য জীবনের ভিড়ে
অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে থাকা অগণিত নষ্ট জীবনকে।

ঝুমা সরকার
ভালোবাসা

ভালোবাসার অলিন্দে তোমার পদধ্বনি
আজও তেমনই সজীব সুবাসিত
সেই নন্দিত হৃদয়ের আকুতি
আজও প্রেমের উজানে বয়ে চলে অবিরাম।

শিহরিত মন কম্পিত হৃদয় নিষ্পলক দৃষ্টিতে
না-বলা অজস্র কথার ভিড়ে
ভালোবাসার অব্যক্ত অনুভূতি
মনের গভীরে চাপা ছিল বহুকাল
কখন কেমন করে এক লহমায় সব আপন হল।

যে পথে আকাশ ছুঁয়েছে মাটি
ফুলের সুবাসে সুবাসিত বন
ছন্দে ছন্দে নদী চলেছে আপন খেয়ালে
সেই পথে হাতে হাত রেখে হাঁটব অনন্ত
জীবনের সব ছবিগুলোতে রং ছড়িয়ে দেব
সুরের তরঙ্গে ভাসিয়ে দেব সুখের তরণি
সুখসাগরের ঢেউ গুনব আমৃত্যু ।
আর স্বপ্নের আবেশে নয়
জীবনকে এবার ছুঁয়ে দেখব
তোমার চোখের পাতায় ।

বীথি কর
প্রেম

শান্ত দিঘির জলে একটুকরো পাথর ছুঁড়ে দেখেছ, আমি দেখেছি,
যেমন তোমার ওই চাহনির মধ্যে আমার চোখের তির।
ছলকে উঠেছে তোমার গভীরতা, দিক ভুল করেছে আমার বাণ,
অবনমিত দৃষ্টি খুঁজে পেতে চেয়েছে দিনরাতের সন্ধিক্ষণ।
কে বলে নেশা শুধু নিষিদ্ধ প্রেমে অথবা দ্রব্যে?
মাতাল হাওয়ায় শরীরের গন্ধে তুমুল নেশা হয়।
প্রথম প্রেমের মতো সবগুলো প্রেমের আস্তরণ সরিয়ে দেখো,
একইভাবে খুঁজে পাবে ঝরঝরে দুপুর কিংবা বৃষ্টিভেজা শ্রাবণ।
তোমাকে নিয়ে কবিতা লিখেছি বেশকয়েকটা,
দেখলাম কবিতারা প্রেমে পড়েছে তোমার চোখে।
ছুঁয়ে দেখার সাধ জন্মালেও সাধ্য হয়নি ছোঁয়ার,
আকর্ষণ বেড়ে চলেছে, ধীরে ধীরে পৌঁছে গেছে গ্রহ থেকে গ্রহে।
তোমায় ভালোবাসি বলা হয়নি বলে অজান্তে গুপ্ত করেছি নিজেকে,
প্রিয়, কাছে এসে একবার বলো কঠিন অসুখে পড়েছ।
আমি পাহাড় থেকে ঝুপ করে নিয়ে আসব বিশল্যকরণী,
কারণ আজ বলছি তোমায় ছাড়া আমি অসহায়।

প্রদীপ দে
যান্ত্রিক

বৈভবের আড়ালে জীবন, জনম-ভিখারি,
ভাঙা-গড়ার ঘাটে
ফিরে ফিরে আসে
ভিক্ষের দাম ধরতে।
গড়ার প্রাচুর্য, ভাঙনের নিঃস্বতাকে,
আমল না -দিলেও, কবজা করতে পারে না;
এ সংসার ধনীকে তোয়াজ করলেও,
নির্ধনের গুপ্ত অহংকারকে ভয় পায়, নিভৃতে
অদৃশ্য ভিক্ষের ঝুলিটা কাঁধের, কিছুতেই
বৈভব-স্বীকৃত হয়ে ওঠে না
এই, ঠুনকো জীবন, অতিথির সাজে-
বৃত্ত-দৌড় সামাল দেয়
আঁতুড়ঘর থেকে শ্মশানঘাট
জনম-ভিখারির, গান শুনিয়ে।

নির্মলেন্দু শাখারু
দুপুরের দিন গোনা

নীরবতা আসে নেমে
রোদ-ঢালা দুপুরে,
ধুলো-পথে মুখ গুঁজে--
ঝিমোচ্ছে কুকুরে।

অলসতা ছায়া নামে--
বসে না--মন কাজে,
ঢুলু চোখে ঝিমুনি--
পায় ঘুম মাঝে মাঝে।

খালে-বিলে খোঁজেফেরে
মাছরাঙা তোলে ঢেউ,
নীরবতা ভাঙে বুঝি--
দূরে কার শুনি ঘেউ?

মাঠে ঘোঁটা-বাঁধা-গরু--
ঘাস মোটে রোচে না,
একা রোদে হাঁটে খ্যাপা--
সুর তোলে তারে-না!

তিলে ঘুঘু ওঠে ডেকে
ঘুঘু ডাক যায় শোনা,
নানা রঙে আঁকা ছবি--
দুপুরের দিন গোনা।

শঙ্খ অধিকারী
কাব্যলক্ষ্মী

বিজয়ের রথ হয়ে এসো অনিন্দিতা!
আমারই কবিতার প্রতিটি অক্ষরে
বিচিত্র ফুলের মতো ফোটো অনিন্দিতা!
নিশ্চল নদী শরীরে শীতল জলের ধারা হয়ে এসো একা!
অগণিত নক্ষত্র আকাশে আদরিণী তারা হয়ে
সারারাত জ্বলে থাকো প্রিয় অনিন্দিতা!
প্রতিটি বসন্তে সুরেলা পাখিটি হয়ে
গান গেয়ে উড়ে যাব দূর দূর মরুভূমি দেশে!
সহস্র ফুলের পাপড়িতে রামধনুর মতন
মিশিয়ে দেব তোমার শরীরের রং!
জয়লক্ষ্মী হয়ে এসো তুমি অনিন্দিতা!
কাব্যলক্ষ্মী হয়ে এসো তুমি অনিন্দিতা!

নন্দিনী সরকার
প্রেম

প্রেম আজকে একলা কাঁদে গহীন রাতে
প্রেমের ভেতর চুরি করে অপ্রেম বাঁচে!

দেওয়া -নেওয়ায় ভরেছে এই জীবন ভেলা
প্রেম সেখানে ঠুনকো ভেবে কাটাই বেলা।

কে শুনেছে আজকে প্রেমে নিজের বলী?
দেখবে তাকে পাগল ভেবে এড়িয়ে চলি!

প্রেমহীনতায় বাঁচতে বাঁচতে যন্ত্র কাঁদে
সভ্যতা তাই আটকে গেছে ধ্বংস ফাঁদে।

টানাটানির সুতোয় হিসেব কোথায় মেলে?
মনের সাথে মনের বাঁধন যাচ্ছে খুলে!

জোড় খোলা যে শুরু হল জন্ম নিয়েই
শেষ কথা কি বলবে তুমি আইন মেনেই?

কণিকা মল্লিক
স্মৃতিটুকু

আমার মরণের পর আলপনা এঁকে দিস
তোর ঠোঁটের আঁকিবুকি দিয়ে
শুইয়ে দিস প্রথম কেনা সাদা চাদরে
জীবনের গান শোনাস কানের কাছে মুখ রেখে
আমি তো রয়ে গেলাম...
তোর স্মৃতির উজ্জ্বল দিনগুলোতে।
মনে পড়ে যদি কোনো অলস বেলায়
আমার লাগানো মাধবীলতায়
কান পাতিস.....
তোর প্রিয় গান শোনাবে হেমন্তের তপ্ত দুপুরে
অথবা শরতের মায়াবী রাতে।
আমি তোর সাথেই থাকব...
ধুলোয় মলিন জানালার উপর
একফ্রেমের ছবিতে।

চিন্ময়ী সেনশর্মা
সোয়াস্তি

অস্তগামী রক্তিমে দেখা শান্তির ছবি
দেখা মিললো সুপ্ত শক্তির;
আতঙ্কে কেটেছে রাতের অন্ধকার!
ভোরের পাখী ডাক দিলো সোয়াস্তির
আনমনের কোনে ইমেল এলো টুং টাং শব্দে
খুশির বর্ষণ শুরু হতেই এক ছুট!
এই প্রথম ভেজা ভেজা ভাব নিয়ে ঘরে ফিরলাম
আবার যাওয়ার আশায়।
যে তালা টা ছিল এতো কাল বন্ধ
চাবি টা নিরুদ্দেশের কারণে .....
হটাৎ কোন ঝড়ে অচলায়তন ভেঙে
দেখা মিললো রাজার।
দিলো রাজাজ্ঞার অবহেলার নির্বাসন।
প্রবল অতৃপ্তির বাসনা ঘোচানোর জ্বালায় গুম হওয়া মন
কাতরাতে কাতরাতে মাথা ঠুকতে লাগলো
অবশেষে সমন এলো .....

এই তো শান্তি -সোয়াস্তি সব মিলে গেলো
তোমার বুকে এসে .....।।

তীর্থঙ্কর সুমিত
সবুজের পথে

সবুজ কত সবুজ
প্রতিদিন ই হারিয়ে যাই
সবুজের দিকে
ঠিকানাটা এখনও রপ্ত করিনি
হয়ত সবুজ ই আমার ঠিকানা
ফেলে আসা অতীতের
হারানো স্মৃতি
আমায় বিস্মিত করেনা
অথবা ভবিষ্যতের ভাবনায়
আমি হারিয়ে যাইনা...

তাই সবুজের পথে আমি নিজেকে সঁপে দিয়েছি বহুবার।

নীলম সামন্ত
আঘাতে ঘর ভাঙে সূর্য না

একদিন একটা মরুভূমি লিখেছিলাম
আমি ও আমার টুকরো ছায়া
বেসামাল বালির ওপর আঁচড়ে ফালা-ফালা করেছি
আদিম
আদিমতম আশ্চর্য

কোন সৃষ্টি নেই
ধ্বংসের ওপর ঘুঘু ফাঁদ

আদিমের ঠোঁটে মুখ নামিয়ে নিঃশ্বাস কেড়ে নিয়েছি
সে প্রতিবাদ করেনি
ভাঙা পেরেক দিয়ে বলেছিল
"আঘাতে ঘর ভাঙে সূর্য না"

মনোজ কুমার মণ্ডল
তমসো মা জ্যোতির্গময়

কৈলাসবাসিনী দুর্গতিনাশিনী
যোগেন্দ্রজায়া জননী আমার,
এ ভূমির বুকে দেখে যাও এসে
চারিদিকে আজ ঘণ অন্ধকার।

মর্ত্যলোকে বোধনের কালে
সরিয়ে সে আঁধার আর কলুষতা
মাভৈ মন্ত্রে জাগাও বিবেক
দলিত যে প্রাণ, শুচি, শুভ্রতা।

দিকে দিকে শুধু ভয়েরই প্রচ্ছদ
দানবের অসি হানে আঘাত,
শক্তি দাও মা ত্রিশূল ধারিণী
ভয় নয়, আজ দেবো প্রত্যাঘাত।

হে সিংহবাহিনী, বিশ্ব জননী
মাতৃ মন্ত্রে চাই অভয়,
আঁধার বিনাশী আপনি প্রকাশো
'তমসো মা জ্যোতির্গময়'।

পল্লব চট্টোপাধ্যায়
দেবী পক্ষ

মুগ্ধ চোখে বিস্ময়ে মাকে দেখি
ভুলে যাই অতীতের সব ব্যাথা যন্ত্রনা
তোমার আগমনী বার্তায়, মহালয়ার সুরে।
পুষ্পাঞ্জলিতে ভরে উঠুক তোমার রাঙা পা,
নাশ করো আসুরিক শক্তি, অহংকার মা তুমি।

দুরন্ত শীতল বাতাসে জুড়াক প্রাণ,ভাসুক সুগন্ধি কাঠি,ধূপ ধূনো।
প্রদীপের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠুক ভক্তের মন
ঢাকে কাঠি পড়ুক যা শুনে সার্থক হোক -কান।
সন্ধি পুজোয় উত্তাল হোক মন্ডপে মন্ডপে
শারদীয় শুভেচ্ছা বিনিময় হোক।
বাড়ুক তোমার মান।

গোপেন মন্ডল
মাটির টানে

মনে মনে আমি ছুটে যাই
পাশের কাঁঠাল গাছের মোটা ডালে,
সেখানে দোলনায় বসে দোল খাই,
আর উড়ে চাই নীলাকাশে।

মাটির দেওয়ালে আঁকা ছবি,
স্মৃতির রঙে এখনো স্পষ্ট,
রয়েছি বহু ক্রোশ দূরে,
তাই মনে পাই কষ্ট।

তেঁতুলের ডালে কোকিল ডাকে,
সবুজ ঢেউ আছড়ায় দিগন্তে
পাতায় পাতায় রোশনাই খেলে,
ঘাস কলমির ঘ্রান আসে বাতাসে বাতাসে।

উঠোন মাঝে ঘুঘর ডাক
শালিখের আনাগোনা,
গোলাঘরে রাখা আছে
পাকা ধান শস্য সোনা।

কাঠবেড়ালির ছোটাছুটি
অনবরত ছাউনি চালে,
পিঁপড়ের মহামিছিল চলে
শুকনো আমড়ার ডালে।

শেওলা ধরা বাঁধানো ঘাট,
সবুজ ঘাসের খেলার মাঠ,
আমার অপেক্ষায় দিন গোনে।
বেলা শেষের আগে ফিরতে হবে
ঐ ঘরে, ঐ গ্রামে
ঐ ভিটে মাটির টানে।

শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়
উদ্বাস্তু

মৃতেরা হৃদয় খোঁজে করে ডাকাডাকি
সফেন সাগর মেখে মানুষ জোনাকি ।

প্রাচীন প্রবাদগুলো মিছিলেতে হাঁটে
হাতে হাত রেখে । উদ্বাস্তু জীবন ঘাটে
ধুয়ে নেয় চোখ মুখ । আবার ভুলেছি
পথ, ভুল করে অন্য কোথা এসে গেছি ।

প্রমীলা মৈত্র
কোথায় পাব তারে

আমি সদাই খুঁজি তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
আমার নয়ন ঘোরেফেরে
আমি খুঁজি নিকট -দূরে।
উতল হাওয়া শুধাই তারে
পাব তারে কেমন করে।

মনের মতো সাজাই তারে
কত না রূপে বাহারে।
চঞ্চল মন উচাটন হয়
আনমনে হারানোর ভয়

আমার মন খোঁজে যাকে।
কাছে তো পাই না তাকে
ভালো বাসবে আদর করবে
মন খুলে বলবে মনের কথা
বুঝবে আমার সকল ব্যথা।

তাকেই তো খুঁজি বারেবারে
আমার মনের মানুষ যে রে!

দেবযানী মহাপাত্র
জলের রঙ

সূর্য ডুবছে
পলাতক মেঘ সব
আঁকাবাঁকা রাস্তা বানিয়েছে
কোথাও চলে যাবে ওরা
অভিমানে অথবা এমনিই।

সূর্য জুড়ে
তোমার মুখ জেগে আছে
আমি দেখেছি।

ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ছ;
মিশে যাচ্ছ কুচো ঢেউয়ে

ওরা দেখেনি
কিভাবে বদলে দিচ্ছ
জলের রঙ।

গুচ্ছ কবিতা

শোভন বিশ্বাস

মা তোমাকে

মা তোমার মুখচ্ছবি
পল্লবিত হয়ে থাকে বুকে
মাতৃহারা আমি বহুদিন আগে।
নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে তোমার স্নেহের আশিস উজ্জীবিত রাখে আমাকে
তপ্ত চোখের জলে তোমার পায়ে
ফুলের ডালি সাজাই বছরে একবার
তোমাকে স্মরণ করে মননে রোদজ্যোৎস্নার আলো মেখে
অক্ষরে অক্ষর গাঁথি বিনম্র প্রত্যয়ে।

কল্পনার কবি

খোকা পড়ে ছড়াবই আঁকে কত ছবি
মনে মনে হয়ে যায় কল্পনার কবি

ধারাপাত পড়েপড়ে চোখে আসে জল
মুখে-মুখে ছড়া যেন ফোটে অনর্গল

বইখাতা কাছে রেখে ভাবে একটানা
কবিতার পাখি হয়ে মেলে দেয় ডানা

এখন সে বাংলার বড় ছড়াকার
দিকেদিকে নামযশ খ্যাতি একাকার।

জীবনের ওঠাপড়ায়

জীবনের ওঠাপড়ায় কখনও মনের আবহ যেন হিরণময় রোদ
স্বপ্নপেখম মেলে ব্যাপ্ত হয় চরাচরে ঝড়-ঝঞ্ঝা এড়িয়ে বেড়ে ওঠে গাছ
শেকড় গাঁথে মাটিতে, কত অবলীলায় নদী ছোটে মোহানার দিকে
মিষ্টি সকালে উষ্ণ দুপুরে
লাজুক বিকেলের কোলাজে
নিজেকে ভাঙি-গড়ি আর তৈরি করি জীবনের নতুন গল্প
যে গল্পে হেরে যাওয়া নেই আছে উদ্দাম বসন্ত।

আলোর খোঁজ

একমুঠো রোদ্দুরে মোছে না সব কালো
চেতনার রোদ্দুরে থাকে দীপিত আলো

রাত এলে চোখ মেলি আলোর আশায়
কতো যে তারার খোঁজ আকাশের গায়

একা ঘরে অন্ধকারে গুমোট বাতাসে
মননে বিষাদরাশি ঘুরে ফিরে আসে

অন্তরে লুকানো সব কুয়াশা সরিয়ে
দিতে হবে সেই স্থানে জ্যোৎস্নাভরিয়ে

ধীরে ধীরে আঁধারের শঙ্কা হলে পার
জীবনের উত্তরণে বাধা নেই আর।

CHITROKTI PATRIKA

দর্পণা গঙ্গোপাধ্যায়

যাযাবর

আধুনিক রীতিনীতি পালটেছে গতিবিধি,
সকলেই ছুটে যায় বিদেশের দরজায়,
পরবেশে সুখ পায় জন্মভূমি নিরবধি ।

মাতৃ শক্তি মহামায়া ধরেছেন রক্তকায়া
রক্তবস্ত্র পরিহিতা যাযাবরে সমাহিতা
ভুলে গিয়ে দেশ ধর্ম রপ্ত করি পরছায়া।

পরভাষা করে রপ্ত বিদেশে হয় আসক্ত,
সোনালী সোনার ধান বুলবুলি কেড়ে খান,
তবু বলি ঘরে থাকো মাথা ঠুকে হই ভক্ত।

যাযাবরে মান বাড়ে যাযাবর মন কাড়ে,
যাযাবরে মন তাই সকলেই হাই ফাই
সপ্তডিঙ্গা তাই ছাড়ে ঠেকে যেন স্বর্গ পাড়ে।

কলির প্রেম

দীঘির আলোয়, পাতার বাস
ফুল ফুটিয়ে ঝরে সুবাস
অলির ভিড়ে কলির প্রেম
শালুক ফুলের জমাটি গেম।।

পদ্ম ফুলও উঁকি মারে
রঙিন ফুলে পথের ধারে।
দীঘির জলে চাঁদের মুখ
প্রেম জমানো রাতের সুখ।

কালি কলমে

আমি শুনতে পেয়েছি গভীর রাতে,
যন্ত্রনায় কাতরানো মানুষের কান্না।
আমি শুনতে পেয়েছি সেই মানুষদের কোলাহল!
যারা ঢিল ছুঁড়ে মারে,পাগল বলে প্রতিদ্বন্দ্বীকে...
শুধু নিজেদের উন্নতি আর আত্ম-আস্ফালনে ব্যস্ত!
অপরের দিকে যাদের
একটু সহানুভূতির দৃষ্টি নেই তারাই নাকি মানুষ
বাহবা কুড়োয়
অজস্র মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যায় অসহায় পাগল।
তবুও তবুও সে বেঁচে যায় কবির কালি কলমে---

চেয়ে থাকি

জন অরণ্যের ছায়ায়, গভীর অন্ধকারে আমার বাস
সবাই গিয়েছে ফেলে।
উন্মুখ হয়ে চেয়ে থাকি।
রোজ ভাবি বেকার উত্তর পুরুষ নতুন কাজের খবর হাতে আসবে,
একসাথে পেট পুরে ভাত খাব
অনেক আনন্দ হবে
সবাই আসবে
তবুও দুচোখ জুড়ে শুধু আঁধার নেমে আসে।

সেই মুখ

স্ফটিকের মধ্যে প্রতিবিম্বিত এক মুখ, খুব সুন্দর, নিটোল
চেয়েই থাকি, অপলক
আশ মেটে না।
রোদ ঝলমলে আছড়ে পড়া ঢেউ,দুলকি চালে ভাসে ট্রলার।
রূপালী চাঁদ
রূপালী মাছ
দুজনেই বড়ো চঞ্চল।
রূপালী আলেয়ায়, সেই মুখ

কোলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ভারত

নীলাঞ্জনা হাজরা

প্রকৃতি প্রেমিকরা যদি মূর্তি প্রেমিক হয়

একটা প্রান্তর, ভীষণ আপন
একটা দিগন্ত শুধুমাত্র নিজেদের
একটা ভাষাকে মিলিয়ে জীবন
একটা সুর যে ভীষণ সুন্দর ।
চাহিদারও অন্তরে গাঁথা ।
অসম্ভব কিছু আশা নেই
ব্যথায় ব্যথায় জীবনের মোড়
তবু প্রকৃতির অনুরাগে ভোর ।
সেখানে যদি লালসার ক্ষত
অন্ধকারে শুধু বিক্ষিপ্ত
প্রকৃতি বোধ পেয়ে যায় লোপ,
মূর্তি এসে দখল নেয়
ভাব,ভাবনা সরিয়ে,মুছিয়ে
চিন্তার ধারা শুকিয়ে যায় ।
দারুণ দারুণ মন্ত্র শুনিয়ে
প্রকৃতির ক্ষয় অসহনীয় হয়।

একটা গীঁট খুলতে পারিনি

অনেক চেষ্টার পর
যে সমস্ত চেতনারা
ফিরে এসেছিল,সেখানে
একটা গীঁটের ভাবনা ছিল ।
গীঁট খোলার উদ্যোগ ছিল
সব কিছু একই চেতনায়
আবদ্ধ ছিল ।
কিন্তু গীঁটটা খোলা যায় নি।
আসলে গীঁটটা খুলতে গেলে
অনেক কিছু ছাড়াতে হবে ।
সকলে তো ছাড়তে বা ছাড়াতে চায় না।

সবুজ রেখাপাত

সারা পৃথিবীর
সব সীমান্ত
সবুজ রেখাপাত দিয়ে
সাজানো থাকলে
ভৌগোলিক রাজনীতি একটু
উন্নত হতে পারত।
কার্বন মানসে সব বোধ
শুধু ছাইয়ের জন্ম দেয় ।
ছায়ার বৃত্ত দেয় না।

সাদা ফুল

সাদা ফুল
সাদা কথা
সাদা বোধ
সাদা ঝোঁক
এগুলো সাদা পতাকাকে
আরো ওপরে ওড়াতে সাহায্য করে।
যেমন ভাবেই সদ্যজাত শিশু
সাদা কোলে সাড়া দেয় ।

একটা দিন

অনেক দিন চলে যায়
পেরিয়ে আসি
সেই ফেরিঘাটে
যেটা মাঝে অস্তিত্ব বোধকে
টের পাওয়ায়
বোঝা হিসেবে নয়।
অনিবার্য সত্যের পথ ধরে
এই ঘাট তোমার জন্য
অপেক্ষা করতে চায় ।

CHITROKTI PR

ঈশিতা পাল

বসন্তে ধূসর মেঘ

অনেকগুলি বসন্ত পেরিয়ে আজ মধ্যগগনে সূর্য,
আজ আর সেই উচ্ছাস নেই,
আনমনা মিঠেকড়া রোদ নেই।
এখন আর রাস্তা জুড়ে লাল-কমলা পলাশ-শিমূলেরা,
আমাকে পাগল করেনা-
এখন দূর থেকে পথিকের মত দাঁড়িয়ে
এক জ্বলন্ত জীবন প্রত্যক্ষ করছি।
কৃষ্ণচূড়াকে ছুঁয়ে আসা দামাল হাওয়া,
আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়না আর-
আমি দূর থেকেই বসন্তের আনাগোনা দেখি।
কেমন একটা ধীর-স্থির দুপুরের প্রহেলিকা হয়ে গেছি আমি-
সব আছে, তবু যেন কি নেই
থেকে থেকে মন উদাস হয় বাউল গানে,
মনখারাপেরা জানলা দিয়ে উঁকি দেয়।
একদিকে জীবনের সাথে পাকা অভিনেত্রীর মত অভিনয়,
আরেকদিকে একাকীত্ব সুর বুনছে কান্নার-
ধূসর মেঘ এসে নামে লাল-কমলা বসন্তের দিনে।

আমরা দুজনে

লোকে বলে-আমি গাইতে ভুলে গেছি,
তুমি না হয় একটা গান লিখে দিও,
আমি তাতে সুর বেঁধে দেব।
লোকে বলে-আমি নাকি কথা বলিনা আজকাল,
তুমি কত কথা বলে চল দিনরাত-
তোমার কথাদের দিয়েই কবিতা বানাব না হয়।
আমি নাকি খুব একটা আর হাসিনা,
মনে জমা চাপা কান্নাগুলো একদিন বৃষ্টি হোক-
তারপর প্রাণভরে হাসব আমরা দুজন,দেখো।

বন্ধু, দেখা হবে

বন্ধু, বল কবে যাব তোর কাছে?
ক্যালেন্ডারে গোল দাগ,ভুলে যাই পাছে!
অনেকদিন পরে যখন প্রিয়মুখ দেখি,
সেই ক্ষণকে যত্ন করে নীলখামে রাখি।
উড়িয়ে খুশির ফানুস তখন আমরা দুজন ছুটি,
ছেলেমানুষিরা হবে সেদিন হেসেই কুটিপাটি।
মুহূর্তেরা বন্দী হবে মনের অ্যালবামে,
আমায় তুই রাখতেই পারিস ডাইনে কিংবা বামে।
মনের দরজা খুলে তখন হাসির ফোয়ারা,
সেদিন যেন থাকেনা আবার বাড়ি ফেরার তাড়া।

ভুলে যেও প্রিয়

তোমাকে ভুলিনি আমি প্রিয়,
তুমি কিন্তু আমাকে ভুলে যেও-
নতুনের ডাক ওই শোনো,
বসন্তের দিনে সুখ চিনো।
আমার শুধু স্মৃতিগুলোই থাক,
তোমার জীবন বিজয়রথ পাক-
আমি তো বন্দী বাতিলের ঘরে,
আমার স্মৃতিদের দাও হাত ছেড়ে।

আমার স্বপ্ন

যেখানে চাঁদ তারারা আছে,
যেতে চাই সেই আকাশের কাছে-
উড়ব আকাশের বুকে ঘুড়ি হয়ে,
ভেসে থাকব মেঘেদের গা ছুঁয়ে।
হতে চাই ওই আকাশের পাখি,
তাই আকাশপানে চেয়ে থাকি-
বুঝিবা আকাশকুসুম ভেবে চলি,
তবু দিনরাত জুড়ে স্বপ্ন বুনে চলি।

CHITROKTI PATRIKA

শুভদীপ দত্তপ্রামানিক

মহিষের ভাষা

পুকুরদের কূটনৈতিক আলোচনা সভায় এখনো থেমে আছে চাষির খসে পড়া লাঙলের কথা।
লাঙল সমর্থন করেছিল মহিষের ভাষা
কি বলবে মহিষ — ফুলে উঠছে একাগ্রতার কৌমুদী পাঠ;
মানুষ শুনছে ভাত চুপ কেন ছিল এতদিন
অস্বস্তি বাড়ে দক্ষিণ বাতাসে!

এই আমি একদৃষ্টিতে দেখি শূন্যের বাড়ি
শূন্যের বাড়িতে উঁচুতলার চিল খোঁজে মায়াবী গ্রহণ।

কূটনৈতিক আলোচনা শেষ
বেশ কয়েকটি পুকুর ঝাঁপ দিল পিতৃমন্ডলে।

শান্তিনিকেতন

সুজাতা মূর্তির কাছে দাঁড়িয়ে শুনছি গিটার ও গিটার
প্রণতি ঘোষ গিটার বাজায়।

আমরা গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণচূড়া আলো জ্বালাতাম
সূর্যাস্তের গাছে দ্বিতীয় সংসার।

বাসে চেপে কংকালীতলা
শ্মশানে বসে আছি
কুকুরটা জিভ দিয়ে চাটছে রক্তাক্ত পা!

না-জানা কেউ খিচুড়ি ভোগ দিয়েছে আজ
প্রণতির গলায় মিথ্যা ঢেঁকুর?

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পাঠাগার

সম্পূর্ণ খোয়াইয়ে সাজিয়েছিলাম কাল্পনিক সংসার,
ইউক্যালিপটাস সাক্ষী
নীরব সংসারে
পাতা ছিল না, গান গেয়েছিল জগন্নাথ বাউল।
ব্যালকোনির টবের মতো আমাদের প্রেমে প্রজাপতি আসেনি
সারাটা বর্ষা ঝগড়া করেছিলাম কালো বাড়ির সামনে।

চাঁদ ওঠেনি - দূরে দ্রিমি দ্রিমি, দূরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পাঠাগার
সাইকেল চালিয়ে পিছনে মৌ ফিরলাম সাঁওতাল পরিবারের কাছে।

জোনাকিসূত্র

আগ্নেয় দ্বীপে মুদ্রা খুলে বসি
কামুক সাপ ছোবল গুটিয়ে রাখে জলপদ্মে
ধনুক সমুদ্রে দুর্গা প্রতিমা বানায় একজোড়া অসুর
ক্ষয়ে যায় রমণের সময়!

অসম ভিড় ঠেলে উঠে পড়ি কাঙাল হরিনাথের ছায়ায়
জোনাকিসূত্র বুঝতে পারছি না বলে আমাকে বলা হল অসামাজিক — জানি মূর্খ আমি না।
দ্বীপে খড়ের ঘর, বামন ঘোড়া, তোমার পায়ের নীচে রাহুস্থল।

মুদ্রা খুলে দেখি
মন্ত্র গতিতে বয়ে আসছে বিষধর কলসি!

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

ভবানীশংকর চক্রবর্তী
অমল কর: স্রষ্টা ও সৃষ্টি

বাংলা সাহিত্যে লিটিল ম্যাগাজিন আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য যে অসীম, সেকথা আজ প্রমাণিত সত্য এবং বহু চর্চিত বিষয়ও বটে।এই আন্দোলনের বিগত কয়েকদশকের অন্যতম পরিচিত ব্যক্তিত্ব অমল কর। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ছোটোপত্রিকা সমন্বয় সমিতির সম্পাদক। তাঁর এই সাংগঠনিক দক্ষতার ব্যাপ্তি আরও দূর প্রসারিত। আমরা সে আলোচনায় পরে আসছি। বাংলা ছোটোপত্রিকা জগতে কেবলমাত্র সাংগঠনিক দক্ষতার গুণেই যে তিনি অতি পরিচিত,এমনটি নয়। সাহিত্য সৃজনেও তাঁর মুনশিয়ানা ও প্রাচুর্য তাঁকে খ্যাতির আসনে বসিয়েছে। সাহিত্যের প্রায় সকল শাখাতেই তাঁর অনায়াস বিচরণ। কিন্তু এই খ্যাতি তাঁর অমলব্যক্তিত্বকে অস্মিতার ঘেরাটোপে বন্দি করতে পারেনি। বরং তন্নিষ্ঠ করেছে।

এই অমল কর-এর আরও অনেক পরিচয়। তিনি নাট্যকর্মী, ক্রীড়াবিদ, সমাজসেবক, রাজনৈতিক কর্মী এবং দক্ষ সঞ্চালক। তাঁর এই বহুমুখী প্রতিভার গুণে সংস্কৃতি জগতেও তিনি তাঁর নিজের আসন পাকা করে নিতে পেরেছেন, বলাই বাহুল্য। এই যে নানাগুণে সমৃদ্ধ অমল কর, ব্যক্তি মানুষ হিসেবে তিনি কেমন? কেমন তাঁর জীবনের পথপরিক্রমা? প্রায় শৈশবেই পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম থেকে উদ্বাস্তু হিসেবে এই বাংলায়। এখানেই লেখাপড়া, কৈশোর যৌবনের নানারঙের দিনগুলি যাপন।বাবা ছিলেন চিকিৎসক। চিকিৎসক হলেও অর্থ উপার্জনকেই জীবনের ধ্যানজ্ঞান করেননি।তাছাড়া, এদেশে এসে নতুন জায়গায় পসার জমানোও খুব সহজ ছিল না। দশ ভাইবোন।এতবড় পরিবার।সব মিলিয়ে পারিবারিক অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল না।

ফুটবল ছিল অমলের সবচেয়ে প্রিয় খেলা। ক্রিকেট খেলতেও ভালোবাসতেন। কখনো খালি পায়ে, কখনো বন্ধুদের থেকে বুট মোজা চেয়ে নিয়ে ফুটবল খেলেছেন। খুব ভালো ফুটবল খেলতেন বলে ফুটবলপ্রেমিকদের ভালোবাসাও পেয়েছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলার অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে। বড়দিদির কাছে খেলার জন্য বুট ও মোজা চেয়েছিলেন।খেলা ছেড়ে পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়ার উপদেশ দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন দিদি। অভিমান হয়েছিল খুব।সেই ঞঅভিমানের স্মৃতি এখনও ভারাক্রান্ত করে। বাণিজ্য বিভাগে ও কলাবিভাগে পড়াশোনা শেষ করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিবহন নিগমের রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিক হন।চাকরির পাশাপাশি চলতে লাগল নাট্যাভিনয়, খেলাধূলা, রাজনীতি, শ্রমিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন, বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সম্পাদনা ও লেখালেখি। শুরু হল 'ঝড়ো হাওয়া' - র জয়যাত্রা। পাশাপাশি আজি দখিন দুয়ার খোলা, বন্দর, সেবা ও সংস্কৃতি, থিয়েটারের কথা প্রভৃতি পত্রপত্রিকার সম্পাদনা চলতে লাগল। সম্পাদক হলেন পশ্চিমবঙ্গ ছোটোপত্রিকা সমন্বয় সমিতির, আন্তর্জাতিক বাংলা কবিতা উৎসবের মতো বৃহৎ সংগঠনের যুগ্ম-সম্পাদক। এছাড়া অনেক সংগঠনের কর্ণধার ও সংগঠক হয়ে কাজ করতে লাগলেন।যেমন, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক সমিতি, সুকান্ত জন্মজয়ন্তী উৎসব উদযাপন কমিটি, সাংস্কৃতিক সমিতি,কলস্বনা,সাউথ এণ্ড অ্যামেচার অ্যাথলেটিক এসোশিয়েশন, সোমেন চন্দ জন্মশতবর্ষ কমিটি, শহিদ সফদর হাসমি স্মরণ কমিটি,সারা ভারত মাতৃভাষা মঞ্চ প্রভৃতি। নানান প্রতিকুল অবস্থার মধ্য দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে,এত বিপুল সাংগঠনিক কাজ করার পরেও যে পরিচয়টি তাঁকে সেরার শিরোপা এনে দিতে পারে,তা হল সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন। অন্তত সাত হাজার অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন। তিনি সুবক্তাও। এবং এই গুণটি তাঁকে যোগ্য সঞ্চালকের ভূমিকায় সহায়তা করেছে। তিনি অতিকথন বিরোধী, সহৃদয় ও স্পষ্টবাক। স্পষ্টবাক বলেই কারও কারও অপছন্দের তালিকায় তিনি সগৌরবে আছেন।

আমরা যে অমলকে দেখলাম, সে অমল সবার মধ্যে ছড়ানো। এক্কেবারে একলা অমল একজন আছেন। সেই একলা অমল কবি, গল্পকার।আর যেখানে তিনি একলা, সে তাঁর সৃষ্টির ভুবন। সেখানে তিনি স্বরাট। চাকরি,মার্কসবাদ বীক্ষায় দীক্ষিত নানা সাংগঠনিক কাজকর্ম,কবিসভার সঞ্চালনা __এসব করতে গিয়ে নানা

জায়গায় নানা মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় ও মেলামেশা করতে করতে নিজের অভিজ্ঞতার ঝুলিটি ভরে নিয়েছেন সংগোপনে। সেই অভিজ্ঞতার সঞ্চয় থেকে একটু একটু করে নিয়ে,আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে গড়ে তুলেছেন তাঁর কবিতার গল্পের শিসমহল।ওই যে বললাম, সৃষ্টির ভুবনে অমল একা। একান্ত আপন মনোজগতে তাঁর যে অধিবাস, সেখান থেকেই উৎসারিত তাঁর সৃষ্টির ফল্গুধারা। আকাশ নদী মাটি রোদ্দুর হাওয়া বনবাদাড়,এসব তো আছেই। আরও বেশি করে আছে মানুষ তাঁর সৃজনে, চিন্তনে। বিভিন্ন স্বভাবের, বিভিন্ন শ্রেণির,বিশেষত, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ, তাদের সুখ-দুঃখ,জীবন-যৌবন, বিবাদ-সুবাদ, প্রেম-বিরহ, দ্রোহ-অদ্রোহ - সব উঠে আসে অমলের সৃজনের ক্যানভাসে,সত্যতর,নবতর রূপে। কবিতায় অমল বুনে দেন তাঁর চিন্তনের বীজ। আর গল্পে চিন্তনের কল্পনার ও বাস্তবের মিশেলে সেই বীজ বৃক্ষ হয়ে ওঠে।যে - কোনো আপাত ভয়ংকরতার মধ্যেও যে সৌন্দর্যের অধিষ্ঠান,অমল তারই অন্বেষণ করতে করতে এগিয়ে চলেন তাঁর অভীষ্টের পথে।এই অন্বেষা তাঁকে সার্থক গল্পকারের খ্যাতি এনে দেয়। সস্তা জনপ্রিয়তা অমলের অপছন্দ। সাহিত্যের সত্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে সস্তা জনপ্রিয়তাকে দূরে সরিয়ে রাখেন। হয়তো এজন্যই অমল কোথাও কোথাও কখনো কখনো দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেন। রসিক পাঠক সেই দুর্বোধ্যতার আড়াল সরিয়ে খুঁজে নেবেন গল্প রসের অমৃত ভাণ্ডটিকে। এপর্যন্ত প্রকাশিত তিন খণ্ডের গল্প সমগ্রই প্রমাণ করে, সাহিত্যের আঙিনায় গল্পকার হিসেবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা।

অমলের লেখালেখির বহরও কম নয়। এগারটি গল্পগ্রন্থ, আঠারোটি কাব্যগ্রন্থ, দুটি প্রবন্ধ গ্রন্থ, একটি অনুবাদ গ্রন্থ, একটি ছড়ার বই ও ঊনতিরিশটি সম্পাদিত গ্রন্থ। এই যে বিপুলায়তন সৃষ্টি, এর উৎসে আছে ভালোবাসা। নিসর্গ, মানুষ ও আদর্শের প্রতি গভীর ভালোবাসা তাঁকে সৃজনে তন্নিষ্ঠ করেছে।

অমলের গল্পে ও কবিতায় যে স্বর শোনা যায়,তা তাঁর নিজস্ব। তিনি বিশ্বাস করেন, ' যে গল্পের জারণ নেই, হাজারো লিখনেওয়ালার ভিড়ে সে গল্প টেকে নাকি!' সেজন্য দরকার ভিন্ন গল্পভাষা। এবং তাই তিনি নির্মাণ করেছেন।আর তাঁর কবিতায় যে অন্তঃস্বর নিয়ত রণিত হয়, সেখানেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য। কেন-না, শব্দচয়ন ও তার বিন্যাসে তিনি সাহসী এবং অবশ্যই কুশলী।আজও অমলের কলম ক্ষুরধার ও গতিশীল।শুধু এ বঙ্গে নয়, বহির্বাংলায় এবং ওপার বাংলারও বহু কাগজে নিয়মিত লিখছেন তিনি। তিনি একাধিক দৈনিকে ক্রীড়া সাংবাদিকতা করেছেন এবং একটি দৈনিকে শিশুবিভাগ ও রবিবাসরীয়তে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন।অনুবাদ সাহিত্যেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর কবিতা ইংরেজিতে ও হিন্দিতে অনূদিত হয়েছে। তাঁর কবিতায় সুর দিয়ে অনেকেই সংগীত পরিবেশন করেছেন।বাচিকশিল্পীদের তাঁর কবিতা আবৃত্তির অ্যালবামও আছে বেশকয়েকটি। অমল আদ্যন্ত মার্কসবাদ বীক্ষায় দীক্ষিত, আগেও বলেছি। শ্রেণিবিন্যস্ত সমাজ ব্যবস্থায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দৈন্যপীড়িত জীবনের কথাকার তিনি।একথা সত্য।সে জীবনের ব্যথাকান্না তাঁর কবিতার অন্তঃস্বর। রাজনৈতিক বিশ্বাস তাঁর সৃষ্টির প্রেরণাও হয়তো। কিন্তু তাঁর সৃজন মতবাদ সর্বস্ব হয়ে ওঠেনি । এইখানে তিনি সার্থক স্রষ্টা।

অনেক অভিঘাত পেরিয়েও তাঁর বিশ্বাসে তিনি অটল। তথাকথিত বুদ্ধিজীবিকার নামে নিজের বিশ্বাস ও বিশ্বস্ত সত্তাকে কখনো বিকিয়ে দেননি। তাঁর এই চারিত্রিক দৃঢ়তাকে অভিবাদন জানাতেই হয়। অমল এপার বাংলা ওপার বাংলা ও বহির্বাংলা থেকে সাহিত্য-সংস্কৃতি –ক্রীড়াজগতে সুকৃতির স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন নামীদামি পত্রিকা সংগঠন ও ক্লাব থেকে পেয়েছেন তিন শতাধিক পুরস্কার, সংবর্ধনা ও সম্মাননা।সাহিত্য নাটক ও খেলাধুলোর জন্য পরিভ্রমণ করেছেন বিভিন্ন রাজ্যে। জয়ী হোক অমলের সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গন-উঠান। জয় ছাড়া অমলকে কিছুই মানায় না।

ছড়া

ক্ষুদিরাম নস্কর
বাঘের ভাষণ

জনসভা দেখতে এলো সুন্দরবনের বাঘ
মুখোশ পরে ঢেকেঢুকে গায়ের ডোরা দাগ।
শুনছিল সে সামনে বসে ভাষণ চমৎকার
নেতার মুখে ভাষণ শুনে গা জ্বলে যায় তার।

বলে কিনা সেও নাকি বাঘের বাচ্চা বাঘ
গায়ে তে তার ডোরাকাটা নেই বলে কি দাগ?
বিরোধীরা বুঝবে তখন বাড়লে তাহার রাগ
পালিয়ে কেউ পার পাবে না জ্বালিয়ে দেবে আগ।

এই না শুনে একটি লাফে মঞ্চে ওঠে বাঘ
মুখোশ ছাড়া বাঘ'কে দেখে ভাগ জনতা ভাগ।
দেখে নেতার চোখ চরক গাছ মারল নিচে ঝাঁপ
বুঝে গেলেন বাপের উপর সবার থাকে বাপ।

হালুম করে দাঁড়িয়ে উঠে বলল কোথায় ভাই
তোদের মত সমাজ সেবক আমার কটা চাই।
মাইক্রোফোনে বাঘ রয়েছে বলছে হেঁকে শোন
জান দেবো তো মান দেবোনা আর দেব না বন।

কার্ত্তিক মণ্ডল
শরতরাণী

শরতরাণী আসবে জানি শিউলি কাশে হেসে
মেঘের ভেলা করবে খেলা শঙ্খচিলের বেশে।

সাজবে মাটি জল আকাশও পরবে নীলাম্বরী
শিশির শিশির ভেজা ঘাসে ঝরবে ঝিরিঝিরি।

গা সিরসির উলকি ছোঁয়া পুজো পুজো ঘ্রাণ
হিমেল হাওয়া দুলছে দোদুল কচি সবুজ প্রাণ।

সাজ পরেছে দূর বনানী রঙ করা চারধার
সবুজ সবুজ ঝিলিক লাগা সুর ভরা ঝংকার ।

মায়ের গায়ে রঙ পড়ছে নাচে নোলক নাকে
শোক তাপ দুখ দূরে রেখে লিখছি চিঠি মাকে।

শ্রীকান্ত মাহাত
কলা গাছেতে কলা পেকেছে

কলা গাছেতে কলা পেকেছে
হলুদ রঙ তাই।
ওই কলা দেখে হনুমান
লোভে কাচাড় খায়।
যাচ্ছে আসছে কলা বাগান
মন ঠহরে নাই।
কখন খাবে ফল গুলান
ধৈর্য্য ধরে নাই।
কলাকে খালি ভালো করলি
বাগান ভাঙো কেন?
বদ্ স্বভাব গেলো না তোর
নরক কীট হেন।
দাদু বলতো পশু থাকবে
পশুর জায়গায়।
পশুর যদি হুঁশ থাকতো
গাছে পাতে কি বেড়ায়?
দেশে পড়েছে ফলের টান
কি খাবি রে হনুমান?
যতোই লাফা গাছের ডালে
ব্রস্তা মেরেছে বাণ।

মোহিত ব্যাপারী
হাসতে হবে

উদাস বাউল মন খারাপের দিন।
আমার একলা যাপন সারাদিন।
উদাস মন একলা ঘরের কোণ।
মন খারাপের হাসি কাঁদে
করুন সুরে একলা মনের ঘরে।
দরজা খুলে হাসতে হবে।
বাইরে খুশি থাকতে হবে খুব।
মনের ভিতর যন্ত্রনাটা মোচড় দেবে।
তবুও সোজা থাকতে হবে।
পড়লে ভেঙে কোমর থেকে নুয়ে
ডালপালা সব ভাঙবে লোকে।
মন খারাপে হাসতে শেখ
উড়িয়ে দিয়ে সব পথের ধুলোয়।
বৃষ্টি দিনেও হাসবে রোদে।

ভ্রমণ কাহিনি

শ্রয়ণ সেন

পানাজির 'ছোটো পর্তুগাল'-এ

মূল সড়ক ছেড়ে বাঁ দিকে ঘুরতেই মনে হল যেন সম্পূর্ণ অন্য একটা জগতে এসে পড়লাম। সরু রাস্তাটার দু'ধারে অন্য রকম স্থাপত্য। আর পাঁচটা বাড়ির থেকে একদমই আলাদা। উজ্জ্বল রঙা এই বাড়িগুলো মোটামুটি দু'তলাবিশিষ্ট। কারও রঙ হলুদ, কেউ সেজেছে আকাশি-নীল রঙে, কেউ বা খয়েরি।

এই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভুলে যাবেন আপনি কোথায়। দৈনন্দিন ব্যস্ততার থেকে কিছুটা দূরে এই পাড়া মনে করাবে আপনি ইউরোপের কোনো শহরে এখন। বাড়িগুলোর স্থাপত্যে পর্তুগিজ ছাপ স্পষ্ট। হাঁটতে হাঁটতে যখন মোহিত হয়ে যাবেন, তখনই বাইক বা স্কুটারের হর্নের শব্দে আপনার সম্বিৎ ফিরবে। আপনি খেয়াল করবেন, না ইউরোপের কোনো দেশে নয়, ভারতেই রয়েছেন।

গোয়ার রাজধানী পানাজি শহরের ফোনটেনহাস পাড়াটি আপনাকে ইউরোপে পৌঁছে দেবেই। মনে হবে আপনি যেন পর্তুগালে এসে পড়েছেন হঠাৎ করে। ঠিক যেমন আমাকেও দিয়েছিল। এখানে দেড় ঘণ্টা সময় কাটানোর পরেও মনে হচ্ছিল আরও বেশ খানিকক্ষণ কাটাতে পারলে ভালো হত।

গোয়ার মধ্যেই রয়েছে আরও একটা গোয়া। ছবির মতো সুন্দর সৈকত, পার্টি, হুল্লোড়, দেদার খানাপিনার গোয়ার আড়ালে এই গোয়া যেন পড়ে রয়েছে দুয়োরানির মতো। এখানে খুব বেশি পর্যটকের পা পড়ে না। জাঁকজমকের আড়ালে থাকা এই পাড়ায় আসতে হলে গোয়ার ইতিহাসটাও জানতে হবে।

১৫১০ সালে বিজাপুরের সুলতানদের হাত থেকে গোয়ার ক্ষমতা দখল করে নেয় পর্তুগিজরা। ছোট্ট এই রাজ্যটায় শুরু হয়ে যায় পর্তুগিজদের প্রভাব। দাপট এতটাই বেশি ছিল যে ব্রিটিশরা এখানে কোনো ভাবেই
নাক গলাতে পারেনি। সেই কারণে গোয়ায় আজও অনেক ক্ষেত্রেই পর্তুগিজ প্রভাব দেখা যায়।

প্রথম দিকে গোয়ার রাজধানী ছিল ওল্ড গোয়ার ভেলহা শহর। এই ওল্ড গোয়ায় রয়েছে বিখ্যাত কিছু স্থাপত্য – সে ক্যাথেড্রাল, বম জেসাস বেসিলিকা এবং সেন্ট আগস্টাইন চার্চের ধ্বংসাবশেষ।

পানাজির এই ফোনটেনহাস পাড়াটি গড়ে ওঠে উনিশ শতকের মাঝামাঝি। ওল্ড গোয়া থেকে পানাজি শহরে রাজধানী সরিয়ে আনেন গোয়ার শাসকরা। এই পাড়ায় গড়ে ওঠে তাঁদের আবাসিক এলাকা। তবে কোনো রকম পরিকল্পনা ছাড়াই এই ফোনটেনহাস গড়ে উঠেছিল। সেই কারণে এই সরু গলি আজও এই পাড়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অনেকটা উত্তর কলকাতার গলিগুলোর মতো। তবে পরিচ্ছন্ন।

পুর্বে কেরিম ক্রিক এবং পশ্চিমে আন্তোনিও পাহাড়ের ঠিক মাঝেই অবস্থিত পানাজির ঐতিহ্যশালী এই এলাকাটি। এখানকার বাড়িগুলোর নম্বরপ্লেটেও শৈল্পিক ছাপ স্পষ্ট। বাড়ির স্থাপত্যশৈলী আপনাকে সুন্দর একটা অনুভূতি দেবে। এই পাড়া যেন ছবি-শিকারিদের স্বর্গরাজ্য।

ফোনটেনহাসের সরু রাস্তাগুলোর নামকরণেও কী বৈচিত্র্য। একটি রাস্তার নাম, 'রুয়া ৩১ দে জেনেইরো'। এর অর্থ ৩১ জানুয়ারি সরণি। ১৬৪০ সালে ৩১ জানুয়ারি স্পেনের হাত থেকে স্বাধীন হয়েছিল পর্তুগাল। আবার অন্য একটি রাস্তার নাম, '১৮ জুন রোড'। গোয়াকে পর্তুগালের হাত থেকে স্বাধীন করার জন্য এই তারিখেই আন্দোলন শুরু করেছিলেন রামমনোহর লোহিয়া। সব মিলিয়ে এই পাড়ার প্রতিটি বাড়িতে, গলিঘুঁজিতে লুকিয়ে রয়েছে ইতিহাস।

বর্ষায় গোয়ার সৌন্দর্য অন্য রকম। বর্ষার গোয়া মানে অঝোরধারায় বৃষ্টি, ছাতাতেও যা মাঝেমধ্যে বাঁধ মানে না। সেই বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই বেরিয়ে পড়া। বৃষ্টিকে থোড়াই কেয়ার করে কাকভেজা হয়ে যাওয়া। বর্ষার গোয়া মানে চারিদিক সবুজ, যা এক দিকে যেমন চোখের আরাম অন্য দিকে মনেরও শান্তি।

বর্ষার এই গোয়াতেই ফোনটেনহাসের বৃষ্টিমাখা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার মধ্যে একটা অন্য রকম অনুভূতি রয়েছে। অন্য রকম মাদকতা রয়েছে। এই মাদকতা কিন্তু সহজে আপনার কাছে আসবে না। একে খুঁজতে হবে।

তাই গোয়া বেড়াতে এলে জাঁকজমকপূর্ণ জিনিসগুলো কিছুটা সরিয়ে রেখে একবার অন্তত চলে আসুন এই ফোনটেনহাসে। ইতিহাসের সঙ্গে গা মাখামাখি করুন। সুন্দর একটা অভিজ্ঞতার সাক্ষী থাকুন।

অনুবাদ কবিতা

বাংলা অনুবাদ: নীলাঞ্জন কুমার
মৃত্যু
মুল রচনা: 'Death' – W B Yeats

মৃত্যুপথের পথিক এক পশুর হৃদয়ে
কোন দোলাচলই আসেনা
মৃত্যুভয় কিংবা বাঁচার আশা নিয়ে ।
অথচ মানুষ কত ভয়ে ভয়ে
বাঁচার আশায় মৃত্যুর দিকে চেয়ে থাকে!
তাই সে বারবার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে
আবার বেঁচে ওঠে!
গর্বিত মানুষ বারবার হত্যাকারীদের
সামনে দাঁড়ায় মৃত্যুর মুখোমুখি
হওয়ার জন্য ।
মানুষ জানে প্রকৃত মৃত্যুর অর্থ
মৃত্যু যে তার হাতে গড়া ।

গল্প

অমল কর
দিলরুবা

সারাজীবন ভোগ পেরিয়ে পড়ে থাকে অনন্ত ভোগান্তি। কত বিদগ্ধ কাহিনি স্মৃতি হয়ে ছলকে ওঠে। রোদের নদীর মতো চলকে ওঠে সেসব কথনছবি। হাওয়া নড়ে, হাওয়ার ভেতর ভেসে ওঠে বিষণ্ন অতীত।

তখন আমার পুঁচকেবেলা পেরিয়ে স্কুলবেলা। পাখি প্রজাপতি ফড়িং পোকামাকড় জীবজন্তু নিয়ে খুনসুটি। খেলাধুলো সাঁতার বালকবেলার সকলের।

যথারীতি ধর্মখেকোদের কারসাজিতে দু-বাংলা ফাঁক হলে, হিন্দু হবার অপরাধে অপমান সইতে না-পেরে আমরা এপার বাংলায়। ওপারের মোল্লাদের বিধান ডাক্তারবাবু, 'অনে দেশ ছাড়ি ভারতে চলি যানগই।' সিদ্দিক মিঞা প্রতিবাদ জানালে মোল্লারা রে-রে করে ওঠে 'এই শালা ডেঁডার (হিন্দুর) দালাল, কিরিচ দিয়েনে এককোপে কল্লা কাটিয়েনে ধড়-মুণ্ডু ফাঁক করি দিয়ম।' তারপর আজ এখানে কাল সেখানে টানাপোড়েনে কলকাতার যাদবপুরে বসত।

কলোনি-সংস্কৃতিতে রোদ-জ্যোৎস্না মশকরা দেয় আমাদের টিনের ঘরে। চোখেমুখে ঢোকে শীত। ঝড় এলে ঘর নড়ে। ওপার বাংলায় আমাদের সমগ্রজুড়ে নাচত ভাত। বাবা চিকিৎসক হলেও এখন একটামাত্র রোজগার, অনেক হা-পিত্যেশ খিদে।

কাঁচা বাড়ি থেকে ডাঙ্গা-দহলা পেরিয়ে নেমে এসেছে একটা পায়ে হাঁটা পথ। পথের দু-ধার সাধ-সাযুজ্যে গড়ে ওঠেছে টিনের-টালির-খড়ের ছাউনি মাথায় নিয়ে সূর্য ঢাকার আচ্ছাদন।দিনে দিনে জেগে ওঠে জীবন। বৃষ্টিরাতে ঝলকানো চমক ছাড়া বিদ্যুৎ দেখিনি কেউ। সাঁঝ নামলেই পুকুরের দিকে ঝোঁকা জাম কেমন ঝিম ধরে বুড়ো ভাম। দিঘি থেকে ওঠে আসে ডাকাবুকো অন্ধকার আর ওপাশে শেয়ালের হাঁক।

তারপর প্রতিসন্ধেয় বেশ খেলা দেয় কে বা কারা, বাঁশ ডগায় কন্দ খেলে _ ঝমরঝম ঢিল ফেলে আমাদের টিনের চালে । সঙ্গে অলিগলিতে তাফাল কুকুরের চিৎকার। ঢিল-বৃষ্টিতে আমরা কেমন অসহায় জবুথবু হয়ে বোবাভয়ে বিষণ্ন গিলতাম।

বাবা বলতেন, এসব নিয়ে তোর ঘর-দোর! সম্পর্ক রাখিস কেন এসব বেয়াদব বদতমিজদের সাথে!

প্রতিসন্ধেয় ক্লেদ মেখে দিনের আলোয় বন্ধুরা বাঁকা তাকায়। অসীম বলে, 'পাহারা দিয়ে ধরলেই পারিস কারা এই অনিষ্ট করছে। তুই একটা আস্ত ইয়ে।' পাড়া পেছনে ঘেউ দেয়। প্রতিপৃষ্ঠায় ওদের তাচ্ছিল্যের হাসি। কারা যে পাঁচরকম ছুরি শানায়! কে ওড়ায় এমন শয়তানি তক্কে তক্কে পাহারা দিয়েও এঁটে ওঠতে পারি না । ভূতুড়ে জ্যোৎস্নায়ও নেচে ওঠে পাথরবৃষ্টি। ঘাসের রক্তপাতে লাল হয় প্রত্যহ মাটি।

চিরদিন পাপোশ থাকব নাকি ধুলো হয়ে? ডিঙোতে হবে আগুন । পায়রা ঠিক আকাশ ছেনে জেনে নেয় আলো। ভাঙা নৌকা নিয়ে ঢেউ ভাঙতে ভাঙতেই এগুতে হবে। দিনবদলের রং লেগে থাকে দিনগুজরানের মধ্যেই। মনে মনে ছকে ফেলি কিশোরবেলার কেরামতি।

নির্জন ওড়ছে। ঘুঘু ডেকে চলেছে। কুবোর নিরবচ্ছিন্ন কুব কুব। বাসন-দুপুরে পাড়া তখন ভাত-ঘুমে ঢুলু ঢুলু। সূর্যের দাঁত খাচ্ছে মাটি-জল। দূরে পিচরাস্তা থমথমে রোদে পুড়ে খাক । রাস্তার জিভে মানুষের রক্তের স্বাদ। মাঝেমধ্যে বুনো ক্ষ্যাপা বাতাস ঢেউ তুলছে। আমি আর সহপাঠী দিলীপ তখন এলোমেলো পাথর জড়ো করছি গাছ-ছায়ায়। টুকুস-টুকুস পাথর ভাঙার শব্দে পাড়া নড়েচড়ে ওঠে খানিক। টের পেয়ে যান বাবা -মা আমাদের স্কুল কামাই । মা শোর তোলেন, 'ইস্কুলে যাসনি।' বাবা তেড়ে আসেন, 'কী ভেবেছ তুমি, বখাটের সাথে দিন যাবে? এই দিলীপ, তোর স্কুল নেই?' দিলীপ কাঁচুমাচু,' না মানে ....।' আমি শুধু করজোড়ে অপরাধ স্বীকার করে সন্ধে পর্যন্ত তাঁদের কাছে নিস্তার চাই।

তারপর সূর্যাস্ত টের পেতেই আমাদের টিনের চালে পাথর-বৃষ্টির আগেই আমার আর দিলীপের হাতের মুদ্রায় বেজে ওঠে লক্ষ লক্ষ দিলরুবা। গাছের পাখিরা কঁকিয়ে ওঠে। অলিগলিতে কুকুরের ঘেউ, শেয়ালের হুক্কারব। ঢিল ছোঁড়া দূরত্বের সমস্ত টিনের চাল তখন আমাদের পাথরবৃষ্টির কাহারবা আর দাদরা বেজে যাচ্ছে নিরন্তর। জেগে ওঠেছে পাড়া তখন।

আমাদের টিনের চাল স্বস্তি ফিরে পায়। আর কোনোদিন পাথরের ধারাপাত হয়নি ।

কাশীনাথ সাহা
ঈশ্বরের মুখ

ডাঃ ব্রতীন রায়ের মায়ের আজ শ্রাদ্ধ শান্তি অনুষ্ঠান। বেশ ধুমধাম করে সমস্ত কিছু আয়োজন করেছেন উনি।প্রচুর মানুষ আমন্ত্রিত। শহরের সবচেয়ে নামী ক্যাটারারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। খরচে কোন কার্পন্য করেননি। করবার প্রয়োজনও নেই। স্বামী স্ত্রী দুজনেই চিকিৎসক। নিজেদের নার্সিং হোম আছে। এক্কেবারে উচ্চবিত্ত পরিবার।

এই অঢেল আয়োজন তৃপ্তি ভরে দেখতে দেখতে দশ বছরের ছেলে আর্যকে বললেন, আমি মরে গেলেও এইরকম জাকজমক ভাবে শ্রাদ্ধ শান্তি করতে হবে তোকে, দেখে রাখ। পারবি তো? ছোট্ট আর্য কিছু না বুঝেই বলল, পারবো বাবি, ঠিক পারবো।আর তোমরা যেমন ঠাম্মি খেতে চাইলে খেতে দিতে না বকা দিতে। তেমনি আমিও তোমাকে খেতে না দিয়ে খুব বকা দেব। ব্রতীনবাবু এই ধরনের উত্তর প্রত্যাশা করেন নি। ছেলেকে প্রচন্ড ধমক দিয়ে বললেন, কি সব আজেবাজে কথা বলছিস, অসভ্য কোথাকার! এক্কেবারে বাঁদর হয়ে গেছিস।

পাশে দাঁড়িয়ে ডাঃ সেন বললেন, আহা ডাঃ রায় ও বাচ্চা ছেলে ওকে ধমক দিচ্ছেন কেন! শিশুরা তো ঈশ্বর। ওদের মুখে ঈশ্বর বাস করেন, ওরা মিথ্যে বলে না। ওরা যা দেখে সেটাই বলে।

গ্রন্থ আলোচনা

ভবানীশংকর চক্রবর্তী
উদ্রিক্ত বেদনার হুতাশ ও নাস্তিকতা

'পুরোনো মানুষের মধ্যে আমরা এতদিনের জানাশোনা সেই পুরোনো মানুষটাকেই দেখতে চাই আবার ' - বর্ষীয়ান কবি নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ' ঈশ্বর এবং মানুষ ' কাব্যগ্রন্থটি পড়ে কবি শঙ্খ ঘোষের এই কথাগুলি মনে এল।এই কাব্যগ্রন্থটির আগে তাঁর আরও বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।সেখানেও নরেন্দ্রনাথ আবহমান মানুষের ও মনুষ্যত্বের কথা বলেছেন বলেই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থেও সেই পুরোনো ফর্মের মানুষ ও মানুষতাকে কবি গতানুগতিক বিন্যাসে পরিবেশন করেছেন, এমনটি নয়। আবহমান মানুষের ও মানুষতার ভেতরেও যে নবতর মানবতার উদ্বোধন,যা কবির অণ্বিষ্ট,তারই শিল্পিত অভিব্যক্তি 'ঈশ্বর এবং মানুষ'। তথাকথিত ঈশ্বর বিশ্বাসকে সচেতনভাবেই তাঁর বোধ ও অন্তরলোক থেকে দূরে সরিয়ে রেখে এবং মানুষকে মৃত ঈশ্বরের প্রতিস্পর্ধীর আসনে বসিয়ে নরেন্দ্রনাথ' সবার উপরে মানুষ সত্য 'এই মেসেজ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই অবিশ্বাস শৌখিন মজদুরি নয়। বরং হৃদয়সঞ্জাত অনুভব।মোট চল্লিশটি কবিতা নিয়ে গড়ে ওঠা এই কাব্যগ্রন্থে কবি পেলব শব্দবন্ধে কবিতার মদিরতার বদলে শানিত তীরের ফলার মতো শব্দ ব্যবহার করে বহুযুগ লালিত আস্তিকতাকে বিদ্ধ করেছেন। মানুষের লাঞ্ছনায় তাঁর চিত্ত দেশে যে বেদনা উদ্রিক্ত হয় সেই বেদনার অভিঘাতে গড়ে ওঠে তাঁর কবিতার অবয়ব। সেই অবয়ব ঋজু, সংহত,অথচ কঠিন ও তীক্ষ্ণ। মানুষ যদি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হয়, তবে কেন মানুষে মানুষে হানাহানি? এই প্রশ্ন নরেন্দ্রনাথকে বিব্রত করে।আর সেই বিব্রত বোধ থেকে বেরিয়ে আসে ' ঈশ্বর ও মানুষ ' ' পায়ের তলায় সভ্যতার আবর্জনা ' ' ভৌতিক ঈশ্বর ' ইত্যাকার কবিতাগুলি। কবি নরেন্দ্রনাথ মরমী।তাই তিনি লেখেন -
১। ঈশ্বর যিনি জীবনের লাগাম/ধরে রেখেছিলেন/তিনি নেই। (ঈশ্বর ও আমি)
২। জেগে আছে, জেগে থাকে ভৌতিক ঈশ্বর। (ভৌতিক ঈশ্বর)
৩। পড়ে আছে দেবতাদের ক্ষত বিক্ষত লাশ/পূজারি ব্রাহ্মণ সহায় সম্বল হীন হাঘরে ভিক্ষুক। (উত্তরাখণ্ড) ইত্যাদি।

বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন সৌম্যদীপ দাশ।বিষয়ভাবনার সঙ্গে বেশ সম্পৃক্ত। ছাপা ও বাঁধাই বেশ ভালো। কাগজ আরও একটু ভালো হলে ভালো হতো। সব মিলিয়ে হাতে তুলে নেওয়ার মতো বই।

ঈশ্বর এবং মানুষ
নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
প্রকাশক- শামুক
দাম- ষাট টাকা।

ছোটোদের বিভাগ - আঁকিবুকি

গার্গী চট্টোপাধ্যায় – নবম শ্রেণি

পরিকল্পনা - লোপামুদ্রা, প্রচ্ছদ - গার্গী, সম্পাদনা - শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়, রূপায়ন - চৈতন্য (হায়দ্রাবাদ)

"CHITROKTI" online quarterly Little Magazine published by Subhra Kanti Chattopadhyay from Anandamoyee Apartment, Bose Para Road, Barisha, Kolkata-700008, Designed by Chaithanya K, Hyderabad.
1st Year 6th Issue, Utsav Sankhya, Online, Sept-Oct 2022.